নীলমাধবের কবি হয়ে ওঠার পর্ব - লেখক জীবনের আদল

তুহিনা বেগম

শঙ্খ ঘোষের লেখা কিশোর উপন্যাস সিরিজের সর্বশেষ উপন্যাসটি হল 'শহরপথের ধুলো'(২০১০)। এই সিরিজের নায়ক নীলমাধব তথা নীলু। ' সকালবেলার আলো'(১৯৭২)আর' 'সুপুরিবনের সারি' (১৯৯০) -তে আমরা নীলমাধবের শৈশব-কৈশোরের কিছু কাহিনি জানতে পারি। এই দুই উপন্যাসে নীলুর পদ্মাপারের জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। ' সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসের শেষে দেখা যায় নীলু শেষবারের মত তার দেশকে প্রণাম করছে । তারপর তার জীবনে আসে এক নতুন অধ্যায়। ১৯৪৭- এর দেশবিভাগের ফলে নীলুকে চলে আসতে হয় এ বাংলায়। শুরু হয় তার কলকাতার জীবন -এ জীবনের কথাই ফুটে উঠেছে 'শহরপথের ধুলো' উপন্যাসটির পরতে পরতে। দে'জ পাবলিকেশন থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত 'ছোটোদের গদ্য' গ্রন্থের তৃতীয় উপন্যাস শহরপথের ধুলো'- এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৭০। অথচ এই স্বল্প পরিসরে লেখক তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানাতে তুলে ধরেছেন এক বিস্তৃত সময়ের ইতিহাস। যে ইতিহাসের বর্ণনাতে ভারাক্রান্ত হয় না উপন্যাসের সহজ গতি বরং পড়তে বসে অপার মুগ্ধতাতে ভরে ওঠে পাঠক মন। এ মুগ্ধতার সূত্রপাত কিশোর পাঠকের থেকে শুরু হলেও শেষের কোনো সীমা টানা যায় না।

শঙ্খ ঘোষ নামটি উচ্চারণের সাথে সাথেই আমাদের প্রথমে তাঁর কবি পরিচয়ের কথাই মনে আসে; কিন্তু এই এক পরিচয়ে তাঁকে বাঁধা যায় না। তবে অস্বীকার করার কোনো স্থান নেই যে তাঁর কবি পরিচয়। এ কথার সম্মতি তাঁর বক্তব্যের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়-

কবিতার একটা নিজস্ব আবরণ আছে। তার ভিতরে প্রচ্ছন্ন রেখে অনেক' কথা বলে নেওয়া যায়,অনেক আত্মপ্রসঙ্গ, কত বলেছিও হয়তো। কিন্তু গদ্যে নিজের বিষয়ে লিখতে ভয় হয়, গদ্য এত সরাসরি কথা বলে, এত জানিয়ে দেয়। কেবলই মনে হয় প্রকাশ্য করে এসব বলবার সময় নয় এখন। হাত থেকে কেবলই খসে যায় কলম, যে-কথাটুকু বলবার ছিল সেটুকুও ধরতে পারি না ঠিকমতো।' [১]

তাই গদ্যের মাঝে কবি নিজেকে প্রকাশ করেও পুরোটা করেন না। একারণেই নীলু আর শঙ্খ ঘোষ পুরোটা মিশে যেতে পারে না। তবে কবি শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে কিছু না জেনেও পদ্মাপারে বেড়ে ওঠা নীলুই যে শঙ্খ ঘোষের এক সত্তা; তা পাঠকের বুঝে নিতে একটুও অসুবিধা হয় না। এ প্রসঙ্গে মনে আসে প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্যের কথা-

উপন্যাসের একজন লেখক থাকেন। তিনিই কাহিনীর কথক। উপন্যাসের কোনো চরিত্রের জবানির অন্তরালে তিনি আত্মগোপন করতে পারেন, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে তিনি নিজেকে সেই চরিত্রের সঙ্গে একাভূত করেছেন ওটা একটা শিল্প কৌশল।--- অনেক সময়েই লেখক এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন যেখানে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিজের জীবন- ভাবনার অনেকখানি সেই চরিত্রে ঢেলে দিলেও

Scanned by CamScanner

তাঁর সঙ্গে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ আইডেন্টিফাই করেন না।[২]

নীলু ও তেমন এক চরিত্র । উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই ওপার বাংলা থেকে নীলুরা কলকাতাতে এসেছে বসবাসের জন্য। লেখককেও তাঁর পদ্মাপারের গ্রাম ছেড়ে এদেশে আসতে হয় । দেশ ছাড়ার আগে পূজোর সময় মামার বাড়ির চেনা পরিবেশ; চেনা মানুষজন- বিশেষ করে তার বন্ধু হারুনকে পাল্টে যেতে দেখে নীলু। অথচ একদিন নীলুই তার বন্ধু হারুনকে শুনিয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'-র গল্প । স্বাধীনতা নীলুদের নিজের দেশেই পরবাসী করে তোলে। দেশীয় পরিচয় থেকে বড় হয় ধর্মীয় পরিচয়। তাই তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় । আর দেশ ছাড়ার পরিবর্তে এখানে তারা এক নতুন পরিচয় পাই- রিফিউজি। এই পরিচয় নিয়েই শুরু হয় তাদের দিনযাপন। নীলু নীরবে প্রত্যক্ষ করে এইসমস্ত মানুষের হাহাকার। সে লক্ষ্য করে 'গোটা একটা দেশ নিমেষে কীভাবে খণ্ড হয়ে যায, নিজের দেশ হয়ে যায় অন্যের দেশ, সেকথা এখনও ভালো করে বুঝতেই পারেনি কেউ।'[৩] চারিদিকে মানুষ তখন আপন পরিচয় হারানোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে; এরই মাঝে শুরু হয় নীলুর হোস্টেল জীবন। রামকৃষ্ণ মিশনের হোমে ভর্তি হয় সে। হোমের প্রায় সকল ছেলেই তখন তার মত স্বদেশ হারানো মানুষ। এখানে চলে ভিটে হারা ছেলেদের মানুষ করে তোলার সাধনা। এই সাধনার সাথে সাথেই তৈরি হয় নীলুর মন ও মনন। মিশনের নানা ঘটনাতে ঋদ্ধ হয় সে। একই সাথে নিয়ম মেনে চলা আর নিয়ম ভেঙে চলার পাঠও সে এখান থেকেই শিখে নেয়। তাই হোমের নিয়ম ভাঙা বাদলকে নতার যতটা পছন্দ ঠিক ততটাই পছন্দ নিয়ম মেনে চলা অমিতকে। নিজেই সে অবাক হয়ে যায় তার নিজের এই ভালো লাগাতে-

... সেই বাদলকে বেশ পছন্দ হয় নীলুর। আবার, বাদলের একেবারে উলটো যে অমিত, তাকেও তার ভালো লাগে খুব। এটা বেশ অদ্ভুত। তার মানে কি তার রুচিপছন্দের কোনো বালাই নেই? উলটো-পালটা সবরকমই ভালো?[৪]

এমনই মানুষ নীলু। তাই নিয়মনিষ্ঠ শিবশংকরকে তার খুব ভালো যেমন লাগে তেমনি নিয়ম ভেঙে সে নিজেই যোগেনের সাথে সিনেমা দেখতে যায়। আবার হোমের মধ্যে থাকা দেশপ্রেমিক যতীশকেও তার খুব ভালো লাগত। চারিদিকে দেশ নিয়ে যখন উথাল-পাথাল চলছে নীলুও তখন আপন যন্ত্রণাতে বিদ্ধ হচ্ছে। সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনীতিতে তাকে জড়াতে দেখা যায় না। তবে রাজনীতির পালাবদল তাকেও ভাবায়। চোখের সামনে সে চিমনি কাকুর রিফিউজি হওয়ার যন্ত্রণা দেখে; দেখে চিমনি কাকু জেলে যাওয়ার পর তার চেনা লোকজনদের পাল্টে যাওয়া।

স্বাধীনতা সম্পর্কে চিমনি কাকুই তাকে বলে-...ক তো দেখি, এইটা কোন্ পদের স্বাধীনতা? দ্যাশটারে দুই টুকরা কইর‍্যা ফালাইয়া, তোগো- আমাগো মতো হাজার হাজার মাইন্‌ষের কপালে রিফিউজি লেবেল লাগাইয়া দিয়া, এইটা কোন্ ছাতার স্বাধীনতা রে? গরিব লোকগুলো কি আইজও দুই মুঠো খাইতে পায়? না কি তাগো পরনের কাপড় আছে?

Scanned by CamScanner

না থাকনের জায়গা আছে? কেমনতরো স্বাধীনতা এইটা?[৫]

চিমনি কাকুর এ ভাবনা সেকালের প্রায় সব মানুষের মাঝেই কম-বেশি দেখা যেত। সেখানে নীলুর কিশোর মন প্রাপ্ত স্বাধীনতার যে কোনো মানে নেই-একথা মেনে নিতে পারত না। সব কিছুই যে মিথ্যে হয়ে গেছে তাও সে মানতে পারত না। দ্রুত রাজনীতির পরিবর্তন তাকে অস্থির করে তোলে। এই অস্থিরতা কাটাতে সে নিজের মনেই স্বপ্ন বোনে। সে এমন এক দেশের কথা ভাবে যেখানে কারো কোনো কষ্ট থাকবে না; সে দেশে সবাই সবাইকে ভালোবাসবে। তার কল্পনার পথ ধরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে .utopia '-র কথা। .wikipedia থেকে আমরা '.utopia' সম্বন্ধে জানতে পারি-.a utopia is an imagined community orsociety that possesses higly desirable or nearly perfect qualities for its citizens....one could also say that utopia is a perfect " .place " .that has been designed so there are no problems[৬]. এ ব্যাখ্যা মিলে যায় নীলু র স্বপ্নের সাথে।

কিন্তু বাস্তবে নীলুর স্বপ্ন ভিত্তিহীন। দেশ জুড়ে চলে ভাঙা-গড়ার খেলা। জানুয়ারির ৩০ তারিখের বিকেলে গান্ধিজীর মৃত্যুর খবরে আহত হয় সে। সকল দেশবাসীর মত সেও আপন আত্মমগ্ন শিবশংকর যখন এরকম খবর পেয়েও একমনে অঙ্ক কষে চলে তখন নীলু ভাষা হারিয়ে তাকে দেখতে থাকে। এমনই সব নানা ঘটনা থেকে আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারি নীলু আর সবার থেকে একটু হলেও আলাদা। আর এই আলাদা করে নির্মাণ লেখকের আদলে গড়া এক চরিত্র । তাই লেখক শুরু থেকেই নীলুর মাঝে এক নিভৃতচারি মানুষকে সযত্নে রোপণ করেন। নীলু ভিতরের এই মানুষ সব কিছু দেখে বোঝে আপন মনে অনেক ভাবনা গড়ে তোলে। কৈশোর হল এক জড় ঝঞ্ঝার কাল। সেই ঝড় ঝঞ্ঝা দেখা যায় নীলুর জীবনেও। কিন্তু সবকিছু অতিক্রম করে সে নিজস্ব এক পথ তৈরি করে ফে লে। কলকাতা তার সে পথ নির্মাণে ইন্ধন যোগায়। শঙ্খ ঘোষের নিজের জীবনেও কলকাতার ভূমিকা অনেকখানি-

আর কলকাতা, কলকাতা খুলে দিল সাম্প্রতিকের দরজা। একদিনে নয় দিনে দিনে। সেখানেও ছিল বহিরাগতের ভীরুতা, জানা ছিল না কোনদিকে আছে পথ।[৭]

পথ নীলুও জানত না। চিমনি কাকুর হাত ধরে সে কলকাতা চিনে নেয় । সে চিমনি কাকুর সাথেই পঙ্কজ মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাসদের দেখার সুযোগ পায়। আবার হোস্টেলে দেখতে পায় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। এভাবে সে ছোটোবেলা থেকে যেসব জ্ঞানী-গুণিজনের কথা শুনে বড় হয়েছে তাঁদের দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। চিমনি কাকু, হোমের মহারাজ, হোমের সহপাঠী, তার ছাত্রী পমি, পমির পরিবার- এরকম নানা মানুষের সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে সে অনেক পরিণত হয়ে ওঠে। ক্রমে হয়ে ওঠার চেষ্টা করে এদেশের নাগরিক। তবে বুকের ভিতর আপন দেশের সৌন্দর্য বয়ে বেড়াই সর্বক্ষণ। তাই দেশের কথা বলতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ে। ছাত্রী পমিকে শোনাতে থাকে সে দেশের বর্ণনা –

Scanned by CamScanner

রেললাইন যদি পেরিয়ে যাই সোজা, ডাইনেবাঁয়ে দুধারে দুলছে ধানগাছের সারি, মাঝখানে জলপথ একটু ভাঙা ডাঙা। যেতে যেতে কখনো - বা ছোঁয়া লাগে ধানের, বুক ভরে যায় তাজা হাওয়ায়, ছড়িয়ে থাকে একটা মন-কে মন- করা গন্ধ। তখনও সবুজ হয়ে আছে সব। কদিন পরে আবারও সেখানে গেলে কেমন পালটে যায় ছবিটা- না, ছবিটা নয়, শুধু তার রংটা। সোনালে ছোঁয়া লেগেছে তখন। পাকা ধানের সেই ভরভরাট মাঠ দেখলে টের পেতে কাকে বলে কোলভরা আর কনকধান বুকভরা স্নেহ-।[৮]

নীলুর দেশের এই বর্ণনাতে গদ্যভাষাকে ছাড়িয়ে পাঠক মনে ছড়িয়ে পড়ে পদ্যের মাদকতা।আসলে কবিতার প্রতি তার ছিল এক সহজাত টান।'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসে আমরা সেই নীলমাধবকে দেখতে পাই; যে তার ফুলমামির সাথে কবিতা লেখা আর শোনার খেলায় মাতে। তার প্রথম লেখা কবিতার পাঠকও হয় ফুলমামি। ফুলমামিকে নীলুর বাড়ির সবাই পাগল বলে একপাশে সরিয়ে রাখে অথচ তারই সাহচর্যে নীলু প্রথম কবিতা লেখে। শুধু তাই নয় ফুলমামিই তাকে শিখিয়ে দেয় কবিতা লেখার সহজ পাঠ-'তুই যেমন ভাবিস, যেমন বলিস, তেমনি লিখবি।'[৯] ফুলমামি তার জীবন থেকে হারিয়ে যায় কিন্তু গোপনে চলে নীলুর কবিতা লেখা।

তবে কবিতা লিখলেও নীলু যখন প্রথম কলকাতাতে আসে তখন সে আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানত না। তার পাঠের তালিকাতে ছিল- কৃত্তিবাস-চণ্ডিদাস, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল। হোস্টেলের বন্ধু যোগেনের কাছ থেকেই সে আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে জানতে পারে। জানতে পারে এক নতুন জগতের কথা। যোগেন সর্বক্ষণ আবৃত্তি করে আধুনিক কবিদের কবিতা। একবার নীলু যোগেনের আবৃত্তি করা কবিতার লাইনে ভুল ধরে। যোগেন রেগে যায়। কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে নীলুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।আর মুগ্ধ হয় কবিতা না পড়েও নীলুর ছন্দ জ্ঞান দেখে। এ ঘটনা কবি শঙ্খ ঘোষের নিজের জীবনেই ঘটে। শুধু নীলুর ক্ষেত্রে কবি পাল্টে দেন কবিতার লাইন। তাঁর লেখা 'ধূসর থেকে ধূসর' গদ্যে আমরা তাঁর এই বন্ধু সম্পর্কে জানতে পারি। শঙ্খ ঘোষের না জেনেও ভুল শুধরে দেওয়ার ক্ষমতাতে মুগ্ধ হয়ে সেই বন্ধু তাঁকে আধুনিক কবিতার অনেক বই উপহার দেন। এরপর কবি শঙ্খ ঘোষ এক নতুন জগতের সন্ধান পান। তাঁর কথায়-

...কত তার পাহাড়চুড়ো, কত রুপোলি ঢেউ,কত ছমছমে গুহা আর কত-বা ঝলমলে পথ। যার পড়ি তার সবটা মুহূর্তমধ্যে বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু ছন্দে শব্দে ছবিতে হাতছানি জেগে থাকে পাতায় পাতায়, নতুন নতুন নামের রোমাঞ্চে আবিষ্ট হয়ে যাই, নতুন কবি নতুন কবিতা।[১০]

তবে যোগেনের কাছ থেকেই যে নীলু আধুনিক কবিতা পড়তে শেখে সে সম্বন্ধে উপন্যাসে কিছু জানা যায় না। কিন্তু লেখকের সেই বন্ধু যেমন লেখকের কবি সত্তার খবর সবাইকে

Scanned by CamScanner

জানিয়ে দেয় তেমনি যোগেনও নীলুর কবিতা লেখার কথা সবাইকে জানায়। কিশোর বয়সে প্রথমে আত্মপ্রকাশের লজ্জা নীলুর মাঝে ছিল। তাই সে তার বন্ধু যোগেনকে কাউকে না বলার শপথ করিয়ে কবিতার খাতা দেখায়। কিন্তু যোগেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে । নীলু তখন একবুক অভিমানে তার কবিতার খাতা তিনটি পুড়িয়ে ফেলে। তবে নিজের কবিসত্তাকে সে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারে না। তাই পমি যখন তার কবিতা লেখার কথা জানে তখন এক অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তার মন। পমিকে ঘিরে কিশোর নীলুর জীবনে এক অন্যরকম হাওয়া লাগে। পমি তার এক নিকট মানুষ; যার কাছে সে মন খুলে সব কথা বলে। একটা সময় পড়াশোনার ধরাবাঁধা গণ্ডি নীলুর কাছে অর্থহীন মনে হয়। আর একারণে সে পরীক্ষা শেষ না করে বেড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। নিজের অজান্তেই পৌঁছে যায় পমিদের বাড়ি। কিন্তু পমি দেখা করে না। পমির প্রত্যাখানে মন খারাপ হয়ে যায় তার। আশ্রয় নেয় কবিতার কাছে। পমির দেওয়া খাতাতে আবার লিখতে থাকে কবিতা-

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে একলা বুকে তুলো
শহরপথের ধুলো
ম্লান করে দেয় যতই সে তো ততই করে ঋণী
তাকেই যেন চিনি...[১১]

দেশ হারানো নীলু ক্রমে কবি হয়ে ওঠে। এমনই আভাসে শেষ হয় উপন্যাস। আর হয়তো এভাবেই আমরা পেয়ে যাই এক সাধক কবিকে। যিনি নীরবে নিভৃতিতে থেকে শুধু সৃজন করে চলেন একটার প র একটা কবিতা। যাঁর কবিতা আজও জ্বালা ধরায়। আর তাই-ই দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বে ভরে যায় আধুনিক সব গণমাধ্যম। অথচ তিনি তাঁর কথা বলে নীরব হয়ে যান আবার। মেপে চলায় হয়তো তাঁর জীবনের ছন্দ। তাই উচ্চকিত আত্মপ্রকাশ নেই কোথাও। তাঁরই বন্ধুর কথা দিয়ে তাঁকে জেনে নেওয়া যায় এক লহমায়-

> কিশোর বয়স থেকে এই আত্মমর্যাদাবান, স্বল্পভাষী মানুষটিকে দেখে আসছি। সঠিক সময়ে তিনি ভীড়ের ভিতর এসে দাঁড়ান,আবার সঠিক সময়েই তিনি নিরর্থ কোলাহলের মুখের ওপর শাটার নামিয়ে দেন।[১২]

তাই এইদিকে চলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর একদিকে চলে কবির কলম।

তাঁরই কলম থেকে জন্ম নেওয়া এই কিশোর উপন্যাসের সিরিজটি ('সকালবেলার আলো','সুপুরিবনের সারি' এবং শহরপথের ধুলো') বাংলা সাহিত্যের এক অন্যবদ্য সৃষ্টি। এই সিরিজের মধ্য দিয়ে আমরা নীলমাধবের কিশোর চোখ দিয়ে দুই বাংলার হৃদয় বিদারক অধ্যায়কে ফিরে দেখার সুযোগ পাই। তার অনেক অভিজ্ঞতার সাথে আমরা নিজেদের সহজেই মিলিয়ে ফেলি (যেমনঃ রাতকে ভোর ভেবে হঠাৎ তার সাহসী হয়ে মাঠ পেরিয়ে যাওয়া, রেডি ওতে শুনে কোনো বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে নিজস্ব ধারনা গড়ে তোলা তারপর বাস্তবে না মিললে আশাহত হওয়া....ইত্যাদি) তাই উপন্যাস তিনটি পড়তে পড়তে আমরা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না নীলু কখন আমাদের নিজেদের এক সত্তা হয়ে ওঠে। আর

Scanned by CamScanner

একারনেই গল্প থামলেও মুগ্ধতা থামে না; বরং মন জুড়ে চলে নীলুর প্রথম লেখা কবিতার অনুরনন-

সুখের দুটি পায়রা এসে বসছে জুড়ে একটি ডাল
আমার সেথা কীই-বা অধিকার।
জাগাই কেন বৃথাই সেথা মৃত আশার ব্যর্থ তাল
মনোমাঝেই থাক্ সে হাহাকার।

এই হাহাকার পাঠক মনেও ছড়ায়- সে দিনের সেই দেশ হারানোর মানুষগুলোর জন্য মন উদাস হয়ে যায় আবার একই সাথে একজন বিখ্যাত কবির কবি হয়ে ওঠার গল্প জানতে পেরে পাঠক হৃদয় তৃপ্তির আবেশে ভরে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

১। শঙ্খ ঘোষ, "পা তোলা পা ফেলা", 'বিষয় শঙ্খ ঘোষ ', গৌতম ঘোষদস্তিদার, রক্তমাংস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭,পৃ.১৫৫
২। সুমিতা চক্রবর্তী, "বিভূতিভূষণের অপু : একটি জিজ্ঞাসা", 'উপন্যাসের বর্ণমালা", পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩,পৃ. ৫৬
৩। শঙ্খ ঘোষ, " শহরপথের ধুলো", 'ছোটোদের গদ্য শঙ্খ ঘোষ ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫১
৪। তদেব, পৃ. ১৪৭
৫। তদেব, পৃ. ১৬৫
৬। en. m. wikipedia. org
৭। শঙ্খ ঘোষ, "পা তোলা পা ফেলা", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৮। শঙ্খ ঘোষ, "শহরপথের ধুলো" পৃ. ১৫৯
৯। শঙ্খ ঘোষ, "সুপুরিবনের সারি", পৃ. ১১৫
১০। শঙ্খ ঘোষ, "ধূসর থেকে ধূসর", 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৭০
১১। শঙ্খ ঘোষ, " শহরপথের ধুলো", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
১২। অমিতাভ দাশগুপ্ত, "উত্তরাধিকার", 'অনুষ্টুপ', শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা', অনিল আচার্য (সম্পা), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

Scanned by CamScanner